শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়

শান্তিপুর, নদীয়া

20 তম বর্ষ

সৃজন

বাংলা সাম্মানিক বিভাগীয় পত্রিকা

১৪২১ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক —

শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়

শান্তিপুর, নদীয়া

সৃজন

সন ১৪২১ বঙ্গাব্দ

২০তম বর্ষ

বাংলা সাম্মানিক বিভাগ

শুভেচ্ছা বার্তা

বাংলা বিভাগের পক্ষ থেকে সাহিত্য পত্রিকা 'সৃজন' প্রকাশিত হতে চলেছে, শুনে আনন্দিত হলাম। বাংলা বিভাগ আমাদের মহাবিদ্যালয়ের একটি বিশিষ্ট বিভাগ। প্রতি বছর ছাত্র-ছাত্রীরা শারদোৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এবং তাদের সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পাই এই 'সৃজন' পত্রিকায়। সাহিত্য আমাদের জীবনবোধকে উন্নত করে এবং মানুষ হিসাবে সংবেদনশীল করে তোলে। আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন রইল তোমাদের এই মননশীল সাহিত্য সৃষ্টির শুভ প্রয়াসে। 'সৃজন'এর ধারাবাহিকতা বজায় থাকুক — শুভ হোক পত্রিকার প্রকাশ। তোমাদের সর্বাঙ্গীণ শুভ কামনা করি।

আশীর্বাদ সহ —

রতনেশ মিশ্র

(ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ)

শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়

ছাত্র সংসদের দু-চার কথা

শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের বাংলা স্নাতক বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাকে প্রণাম এবং সকল ছাত্র-ছাত্রীদের ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জানাই প্রীতি, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

আমরা আশা রাখি তারা প্রতি বছরের ন্যায় আগামী বছরগুলিতেও যেন এভাবেই 'সৃজন' প্রকাশে সচেষ্ট হয় এবং নতুন কিছু উপহার দেয়।

অভিনন্দন সহ—

শান্তিপুর মহাবিদ্যালয় ছাত্র সংসদ

পত্রিকা পরিচালন কমিটি

সভাপতি ঃ- অধ্যাপক শংকর সোম

সহ-সভাপতি ঃ- অধ্যাপিকা শুচিস্মিতা সান্যাল

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ- অধ্যাপক প্রীতম কুমার দাস
অধ্যাপিকা সমাধান শিকারী
অধ্যাপিকা অর্পিতা চক্রবর্তী

যুগ্ম-সম্পাদক ঃ- তাপস বিশ্বাস (২য় বর্ষ)
মৃন্ময় দাস (১ম বর্ষ)
শিবনাথ ঘোষ (২য় বর্ষ)

সহঃ যুগ্ম সম্পাদক ঃ- আসিকুর রহমান (৩য় বর্ষ)
সুস্মিতা দাস (৩য় বর্ষ)

কোষাধ্যক্ষ ঃ- সফিকূল হাসান মণ্ডল

ব্যবস্থাপক মণ্ডলী ঃ- প্রথম বর্ষ ঃ- মহুয়া খাতুন, সনাতন রায়, সুব্রত রায়, রানা ঘোষ, রাজকুমার বিশ্বাস।
দ্বিতীয় বর্ষ ঃ- পল্লবী প্রামাণিক, মৌমিতা কুণ্ডু, মৈত্রী আচার্য, সৌনক দত্ত, শান্তনু বঙ্গ।
তৃতীয় বর্ষ ঃ- সুস্মিতা মণ্ডল, মামনি সরকার।

সম্পাদকের কলমে...

নববসন্তের আগমনে কোকিলের কূজন, প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভ ও প্রকৃতির বাঁধ ভাঙা আনন্দোচ্ছ্বাসে দ্বারা দোলায়িত হয়ে আমরা বাংলা সাম্মানিক বিভাগের সকল সৃজনীরা বিভাগীয় পত্রিকা 'সৃজন' প্রকাশের মধ্য দিয়ে স্বাগত জানাতে চলেছি নবাগত বর্ষকে। শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের বাংলা সাম্মানিক বিভাগীয় সকল অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও সকল শিক্ষার্থীরা একত্রে আরো একবার সম্মিলিত হয়েছি বিভাগের সরস ও প্রাণোচ্ছল প্রতিভাকে পত্রিকা 'সৃজন'এর হৃদয়ে লিপিবদ্ধ করার মহৎ উদ্দেশ্যে। আমরা সৃজনীরা বিভাগীয় পত্রিকা 'সৃজন'এর হৃদয়ে আমাদের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে উপস্থিত করতে পেরে গর্বিত, আনন্দিত ও আপ্লুত বোধ করছি।

বিলম্ব হলেও পত্রিকা প্রকাশ করতে পেরে আমরা খুশি। 'সৃজন'এর যা কিছু প্রশংসনীয় ও মূল্যায়নযোগ্য তা সবটুকুই শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের অবদান এবং এর স্বাদু বার্তা তাঁদেরই প্রাপ্য। যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়েছে তা সমস্ত আমাদেরই। আমাদের বিভাগীয় পত্রিকা 'সৃজন' প্রকাশে সর্বাঙ্গীণভাবে সহযোগিতা করার জন্য আমরা শান্তিপুর মহাবিদ্যালয়ের মাননীয় ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ এবং সমস্ত শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সকল শিক্ষাকর্মী এবং ছাত্র সংসদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। আমাদের পত্রিকা 'সৃজন' তখনই সাফল্য পাবে যখন সকলের কাছে উপভোগ্য ও আন্তরিকভাবে গ্রহণীয় হয়ে উঠবে।

ইতি—

সম্পাদক

তাপস বিশ্বাস

শিবনাথ ঘোষ

মৃন্ময় দাস

সূচিপত্র

কবিতা	কবি	পৃষ্ঠা
সৃজন	শংকর ঘোষ	৮
খেলা	প্রীতম কুমার দাস	৯
আজও তুমি	সুচিস্মিতা সান্যাল	৯
কে বেশি মাতাল— কবি না কবিতা	অর্পিতা চক্রবর্তী	১০
ভালবাসা	শ্বেতা মুখার্জী	১১
মরীচিকা	সুমিত রায়	১১
সমাজে নারীর স্থান	শাহিনা খাতুন	১২
একাকী দুপুর	টুম্পা দাস	১৩
বনের পাখি	সুস্মিতা মণ্ডল	১৩
জীবনের মানে	শ্রাবণী সাহা	১৪
জীবন	অর্ক্য হালদার	১৪
অভিমানী রাধিকা	পূজা দাস	১৫
বর্তমান সমাজ	বিষ্ণু হালদার	১৫
সত্যমেব জয়তে নানৃতম্	আমীর সোহেল	১৬
এসো মা দুর্গা	পিঙ্কি বিশ্বাস	১৬
প্রকৃতির তরে	অভিজিৎ ব্যানার্জী	১৭
স্বপ্নের বিহঙ্গ	শতাব্দী বৈরাগী	১৭
আমির সাথে	সুস্মিতা দাস	১৮
মানুষ	দেবব্রত বিশ্বাস	১৯
সমাজচিত্র	পল্লব ঘোষ	২০

গল্প	লেখক	পৃষ্ঠা
উত্তরণ	সমাধান শিকারী	২১
পিতৃত্বের টান	শিবনাথ ঘোষ	২৪
কী নাম দেবো এই গল্পের	বিক্রম বিশ্বাস	২৬
শেষ উপহার	চন্দ্রা ঘোষ	৩০
রহস্যভেদ	অনুশ্রী দাস	৩৩
ধৈর্য্য	নুরসেলিনা খাতুন	৩৫
কপালে লেখা	জয়শ্রী অধিকারী	৩৭
প্রাক্ শারদীয়া অনুষ্ঠান	সনাতন রায়	৩৮

কবিতা

সৃজন

শংকর সোম
(অধ্যাপক)

আজি হতে শতবর্ষ পরে—
ছোট্ট যে ছেলে ছিল আমাদের ঘরে,
শুধানু তারে, ওরে বই কারে কয়?
—ওই যে যার দ্বারা সিনেমা হয়।
সত্যিই আজ ছেলে-মেয়েদের
দিন যায় কেটে,
মোবাইল, ফেসবুক আর ইন্টারনেটে।
পাড়ার লাইব্রেরীগুলি ধুঁকছে,
নাটক নভেল কেউ পড়ে না হালে,
মা-মাসীরা সবাই ব্যস্ত—
রকমারি সব সিরিয়ালে।
এই তো ক-বছর আগের কথা,
পাড়ায় পাড়ায় সেই দিন।
কিছু ছেলে-মেয়ে উৎসাহ নিয়ে,
প্রকাশ করতো ম্যাগাজিন।
চাঁদা তুলে, ঘুরে ঘুরে,
চলতো লিটিল ম্যাগের আন্দোলন।
আজ লেখক পাঠক কেউ নেই
কারো নেই পড়বার মন।
আধুনিক ছেলেমেয়ে বলছে
এই আছি বেশ,
বৃদ্ধরা শুধু ভ্রু কুচকে বলে,
টিভি'তেই করলো সব শেষ।
সেদিন বন্ধুকে শুধানু—
হ্যাঁ রে তোর জন্মদিনে—
পড়েছিস বইটা, যেটা
দিয়েছিলাম কিনে।
বললো, চাপ নিও না বস,
আজ রাতে করবো টস্।
ধরো যদি হেড পড়ে,
রাত কাটাবো ফেসবুক করে।
আর যদি টেল হয়
সোজা কথা কই,
সারা রাত দেখবো
নূতন একটা ইংরাজী বই।
আর যদি কয়েনটা
থাকে মাঝামাঝি,
তবে কিন্তু সত্যি সত্যি আমি
তোমার দেওয়া বই পড়তে রাজি।
তবু আজও আছে কয়েকজন,
সাহিত্যে অনুরাগী মন।
আমাদের পত্রিকা সৃজন
তাদের উদ্দেশ্যে হোক নিবেদন।

খেলা

প্রীতম কুমার দাস
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

ছেলেটা
প্রায় উলঙ্গ অবস্থায়
অর্থহীন খেলেছে ছেলেবেলা।
সূর্যের কিরণ সর্বাঙ্গে মেখে,
বৃষ্টির স্বচ্ছ ধারায় স্নাত হয়ে,
বেশ কটা বসন্ত পার করে,
এখন
বেশ ডাগর হয়েছে সে।
কিন্তু,
সেই স্বচ্ছতা সারল্য ঘষা কাচের মতো এখন,
তার শরীর মনটা কর্কশ।
নদীর ধারে, খোলা মাঠে
উদোম লম্বা দৌড় দৌড়োয় না।
বড় হয়ে পৃথিবীটা ছোট হয়েছে তার কাছে।
এখন সে খেলে নতুন নতুন জামা গায়ে
অর্থপূর্ণ খেলা। এক এক জামা পাল্টে
এক এক দলে — ঘেরা মাঠে — অনেক দর্শক—
অল্প কয়জনে খেলে।

না তার বোঝে না জামা পাল্টানো খেলা।
বলে— খোকা খ্যাল তুই আমার কোলে
জন্মক্ষণের ছোট্ট খোকা হয়ে
আমার চোখে মুখে অবুঝ চোখ রেখে।

আজও তুমি

শুচিস্মিতা সান্যাল
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

রূপ থেকে অরূপে... তুমি
শ্রাবণের বৃষ্টির সঙ্গে
চোখের জলে ধুয়ে
তোমার চেনা রূপ আজ নবীন—
পুনর্জন্ম... আমাদের মনের গভীরে
তুমি কি চিরচেনা আমাদের সেই কবি?
দুখের দিনের একান্ত আশ্রয়
সুখের দিনের গুনগুন গান
মনে মনে জুঁই ফুলের সুগন্ধী
মালা পরাই তোমার গলায়
আজ বাইশে শ্রাবণ।

কে বেশি মাতাল— কবি না কবিতা

অর্পিতা চক্রবর্ত্তী
অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ

"কবির জীবন খেয়ে জীবনধারণ করে
কবিতা এমনই এক পিতৃঘাতী শব্দের শরীর।"

পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে কূলপ্লাবী জ্যোৎস্নার
মায়াবী চাঁদের সাথে ফিসফিসিয়ে কথা বলত সে।

ফেরবার সময় কুড়িয়ে পাওয়া বাবুইয়ের বাসায়
জ্যোৎস্না ভরে আনত। পাখির ডানা ভাঙলে কাঁদত সে।

তাকে খোঁজে আহত পেঁচা। তাঁকে খোঁজে ভাঙা পা কাঠবেড়ালী
তাকে খোঁজে চাঁদনী রাত। তাঁকে খোঁজে থৈ থৈ জ্যোৎস্না।
মরা আকাশে ছেঁড়া নক্ষত্ররা তাকে খোঁজে
খুঁজে খুঁজে ক্লান্ত, ভোরের ঘাস-ফড়িং
ফল্গুনদী তার খোঁজে পাগলপারা
তাকে খুঁজছে মেঘ-বৃষ্টি এক আকাশ রোদ্দুর
আর এই নির্নিমেষ খুঁজে ফেরা কবিকে মাতাল করে
শুরু হয় চারু তোলপাড়, যেন এক নির্জন বনের

বয়ঃসন্ধিকালের কোন্ কিশোরী হরিণীর লণ্ডভণ্ড খেলা
নিজেরই ভিতরে নিয়ে সুবাসের শুদ্ধ কস্তুরীর উজ্জ্বল অনুভব।
পুষ্ট হয় কবিতা, প্রাণ পায়।।

ভালবাসা

শ্বেতা মুখার্জ্জী
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স

সেই প্রথম কলেজে পড়ার সময়।
মনে জাগে ভালবাসার স্পন্দন।
ভালোবাসা মানে একটা ফোটা ফুল।
সেই ফুলের গন্ধ মনকে করে আকুল।।
মন ছুটে যেতে চায় তারই কাছে।
সে কি ডেকে নেবে তার হৃদয়ের মাঝে।।
সেই প্রথম দিনের দেখায় তারে কি ভোলা যায়।
ভুলতে গেলে মৃত্যু তারে কাছে ডেকে নেয়।।
যত বলি ছুটে যাব তারই কাছে।
মন বলে যেও না চারিদিকে কাঁটা ছড়িয়ে আছে।।
সেই কাঁটার আঘাত যখন মনকে করে বিদ্ধ।
মনে হয় এই তো ভালবাসায় আমি আবদ্ধ।।
ভালোবাসা কোন বাধায় শেষ নয়।
মৃত্যুর পর সেই ভালবাসা ক্ষণিক স্থিতি পায়।।
ভালোবাসা মানে শুধুই চাওয়া পাওয়া নয়।
একটা অনুভূতি লব্ধ শান্ত জীবন বইতে হয়।।

মরীচিকা

সুমিত রায়
দ্বিতীয় বর্ষ

শীতের নিশীথে
প্রস্ফুটিত যে ফুল ঝরে গেলো,
কী হবে রেখে তার মলিন দলগুলো।
ক্ষমাহীন কালের বিদ্রুপে,
আজ সব বাসি ও পুরনো।
গভীর হাওয়ার রাতে জেগেওঠে,
নীড়ে দলে দলে উড়ে আসে
ডানার ঝাপট শরীর নিয়ে।
প্রদীপে দপ দপ শিখার কাছাকাছি
রাতের এলো চুলে তিমির কোলাহল,
শীতের সাদা থাবা ছিঁড়েছে বনতল।
ঘন কুয়াশা চারিদিক করেছে নিস্তব্ধতা
তারপর আকাশের সিঁড়ি বেয়ে
জ্যোৎস্না নেমেছে।

সমাজে নারীর স্থান

শামিমা খাতুন
বাংলা অনার্স, দ্বিতীয় বর্ষ

সেই সুদূর প্রাচীনকাল থেকে নারীর উপর
চলছে অত্যাচার।
তখন আদিম আর এখন শয়তান
রূপী মানুষ ধ্বংস করছে সমগ্র নারী সমাজকে।
'নারী' এই শব্দটির মানে এই শিক্ষিত ধনবাদী
সমাজের মানুষ যেন সত্যিই জানে না?
একজন নারীর প্রথম পরিচয় সে একজন মা।
পৃথিবীতে সব কিছুর বিনিময়ে কখনো যাকে
পাওয়া যায় না সেটা হল মা।
একজন নারী মা, মেয়ে, বোন, স্ত্রী সকলের
দায়িত্বই নিষ্ঠা ও ভালোবাসার সাথে
পালন করে।
প্রাচীনযুগের সমাজের বাল্যবিবাহ,
সতীদাহপ্রথা, বহু বিবাহের মতই—
বর্তমান সুশিক্ষিত সমাজে চলছে
ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, ভ্রূণ হত্যার মতো
অবর্ণনীয় ঘটনা?
চারিদিকে ক্যান্সাররূপী পণপ্রথা বিষের মতো
ছড়িয়ে সমাজকে ধ্বংস করছে।
যেখানে এই মমতাময়ী নারীকে সমাজের
সবার উপরে স্থান দেওয়া উচিত!
সে আজ ধনবাদী সমাজের পুরুষ
শাসকের পায়ের তলায়।
দেশে ক্রমাগত নেতা, মন্ত্রী, দল
পাল্টাচ্ছে, কিন্তু হায়!
একবিন্দু পরিবর্তন ঘটছে না নারী সমাজের।
তাই বর্তমান সমাজের কাছে প্রশ্ন!
মা বলে ডাকি যেই নারীকে তাদের
স্থান সমাজের আজ কোথায়?
উত্তর দাও বর্তমান শিক্ষিত, ধনবাদী
যুব সমাজ, উত্তর দাও?

একাকী দুপুর

টুম্পা দাস
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স

নিদ্রাহীন, স্পর্শহীন, চেতনাহীন দুপুর,
খাঁ খাঁ রোদের পায়ে নিস্তব্ধ নূপুর।
শুধু ভাসছে একটা সুর, একটা গান
গোয়ালাদের ওপাড়া থেকে আসছে সুরের তান—
'তুমি রবে নীরবে হৃদয়ে মম'— রবীন্দ্রসুর
ডাকে আমার খোলা ছাদের একলা দুপুর
ঘুরে বেড়াতাম, ছাদের এমাথা-ওমাথা
কার্নিশে খুটোপুটি কদ্মার পাতা।
কদমের গন্ধে মোর মন মেতে যায়,
তপ্ত দুপুর আজ শান্তিতে ঘুমায়।
স্মৃতিতে তার হাসি মনে পড়ে যায়,
অবশেষে আমি ধায় চিলেকোঠায়।
জানালা খুলতেই ঘর্মাক্ত একটা শরীর মনে পড়ে যায়
অনুভূতি সব হারিয়ে যায়
নাকের কাছে ভেসে আসে ঘুরে ফিরে
স্যাঁতসেঁতে ভিজে গন্ধেরা ঢলাঢলি করে।
ধীরে ধীরে দুপুর গড়ায়
গন্ধ বিলীন হয়ে যায়...

বনের পাখি

সুস্মিতা মণ্ডল
বাংলা অনার্স, তৃতীয় বর্ষ

আমি যে এক বনের পাখি
বনেই আমি ভালো থাকি।
বনই আমায় দেয় ফল—
তার থেকেই হয় আমার বল।
বন আমায় বাসে ভালো
তাই তো সোনার খাঁচা লাগে কালো।
বনে আমার কত সখী
আমি যে তাই বনের পাখি!
বন যে দেয় মুক্ত বায়ু—
তাই তো আমার বাড়ে আয়ু।
বনেই যে আছে মাতা-পিতা
বড়ো বড়ো বৃক্ষ-শাখা
তাই তো আমি বনের পাখি
বনকেই ভালোবাসি।

জীবন

অর্ক্য হালদার
বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ

জীবন জীবন জীবন...
কী আছে এই জীবনে
যা কিছু আছে সবই
বিলিয়ে দাও মানুষের মধ্যে।।
ভরিয়ে দাও ভরিয়ে দাও
মানুষের মন...
সেটাই হবে জীবনে
সবচেয়ে বড়ো মূল্যধন।।
ফিরিয়ে দাও ফিরিয়ে দাও
মানুষের মুখের ভাষা
নতুন করে জেগে উঠুক
হাজার হাজার আশা
জীবনে সমস্ত কিছু তুমি
যতই করিবে দান...
অন্তরে অন্তরে সেই দান
তাই গিঁথিবে হয়ে বান
এটাই তো জীবন! জীবন! জীবন!...

জীবনের মানে

শ্রাবণী সাহা
প্রথম বর্ষ

জীবন মানে কি ফেসবুক?
যেখানে হাত বাড়ালেই বন্ধু মেলে
জীবন মানে পথ
পা বাড়ালেই দূরত্ব কমে
জীবন মানে রক্ত মাংসের শরীর
যেখানে মন সর্বদা চিন্তাময়,
মনকে জ্ঞানের আলো ছোঁয়ালে জীবন সুন্দর হয়
জীবন সম্পূর্ণ হয় না প্রেম ছাড়া
অতীতকে বাদ দিয়েও কিছু যায় না বলা।
কার নামই বা প্রেম
বন্ধুরা, তোমরা মনে রেখো প্রেম ইজ গেম।
মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যর্থ হয়েছি
সাহায্যের হাত চেয়ে।
লিখতে আমি চাই কিছু
ভাষা খুঁজি, তুমি কই?
মাটি ছুঁয়েছে দূরের আকাশ
ভালোবাসা ছুঁয়েছে কোমল হৃদয়।
জীবাশ্মে সঞ্চিত অদূর ভবিষ্যৎ।
আমি আমি আর আমার অস্তিত্বে আছে নিঃস্বার্থ ভালোবাসা।

অভিমানী রাধিকা

পূজা দাস
বি.এ., তৃতীয় বর্ষ

বলেছিলে আসিবে তুমি সেই রাতে একাকী
প্রচুর গোপিনী মাঝে কে জানে কে দামী
চঞ্চল বক্ষে তব আমি যে পরকীয়া,
দোষ গুণ নাহি মানি তোমারো লাগিয়া।

কারো কাছে তুমি বধূ কারো কাছে সখা,
আমি বড় যতনে তোমার পাই নাকো দেখা
কালিয়া কায়া তব চক্ষে ভাসি মম—
তাই আমি এ সমাজে কুলশীল অক্ষম।

দিন যায় রাত যায় বয়ে যায় সে সময়
এখনোসখা মম তুমি সে অধরাই;
দেখেছি স্বপনে তব মায়াবন জ্যোৎস্নায়
চক্ষের চাহনির পরিশেষ দিশেহারায়।

কোনখানে তুমি মম রয়েছ তা জান!
তারপর কে তোমার এত মন আপন?
আমি জানি তুমি মোরে করেছ ছলনা
তবু তুমি সুখে থেকো এ আমার কামনা।

মরণে স্মরণে যদি দেখিবারে চাই
একবার দিও গো তুমি আমারে বিদায়।
তোমার কাছে মম এ তব প্রার্থনা
জীবন দুয়ার প্রান্তে যদি গো পুণ্যা।।

বর্তমান সমাজ

বিশু হালদার, প্রথম বর্ষ

কালো হাত কালো বাজার
দুনিয়াটা মন্দ।
চারিদিকে যখন তাকাই
হাহাকারের ছন্দ।।
রাস্তাঘাটে পথের পাড়ে
চারিদিকে চাই।
কালো ধান্দা কালো ব্যবসা
জগৎটাকে ছায়।।
নারী-পুরুষ ছদ্মবেশে
করছে নানা ধাঁধা।
সহজ সরল মানুষগুলো
পাচ্ছে শুধু সাজা।।
ভাবছে মানুষ দিচ্ছে সমাজ
পরিবর্তনের বার্তা।
কেমন জানি বাড়ছে শুধু
রাজনৈতিক বাদশা।।
এইভাবেই কি ঘুরতে থাকবে
রাজনীতির এই চাকা।
যে সমাজে মানবশ্রেণী
খাচ্ছে শুধুই ধোকা।।
তোমার কাছে করছি প্রভু
শেষ মিনতি তাই,
এবার যেন নতুন করে
বিশ্বটাকে পাই।

সত্যমেব জয়তে নানৃতম্

আমীর সোহেল
বি.এ. তৃতীয় বর্ষ

জয় জয় জয় শুধু
সত্যেরই জয়,
সত্যই শুধু ছড়িয়ে পড়ুক
সারা জগতের।
সত্য কথা, সত্য ভাবনা
সত্য খবর বলো,
মিথ্যা পথ বাদ দিয়ে ভাই
সত্য পথে চলো।
সত্য কথা বলো শুধু
সত্যের প্রচার করো,
সন্তানকে করো তুমি
সত্য পথেই বড়ো।
সত্যের জন্য রাত জাগো ভাই
সত্যের জন্য লড়ো,
মিথ্যার পিঠে চড়ে ভাই
সত্যকেই শুধু ধরো।
সত্যের জন্য চলো ভাই
জীবন উৎসর্গ করে,
সত্য কর্ম করেই শুধু
শান্তি পাবে মরে।

এসো মা দুর্গা

পিঙ্কি বিশ্বাস
দ্বিতীয় বর্ষ

শরৎ ঋতুতে এসো মা দুর্গা।
তোমার পূজায় মেতেছি দশভূজা।।
করি সবে মিলে প্রার্থনা।
সকল জীবের মঙ্গল কামনা।।
আনন্দে করি পূজা পরিক্রমা।
আলোকে সজ্জিত মণ্ডপ প্রতিমা।।
কাটে রজনী আনন্দে উৎসবে।
দশমী তিথিতে আসে অশ্রুজলে।।
মনের মলিনতা দিলে মা দশভূজা।
আনন্দে বেদনার জীবনে এসো মা দুর্গা।

প্রকৃতির তরে

অভিজিৎ ব্যানার্জী, প্রথম বর্ষ

ঋতু হল আমার আশা
তোমার ভালোবাসা,
গ্রীষ্ম দিয়ে শুরু তার
সবাই নিরাশা।
বর্ষায় তার পরিণতি
ব্যাঙের গণ্ডগোল,
শরৎ যখন কাশফুলেতে
দেবীর ডামাডোল।
দেবীর নিজ গৃহে
গমনের সাথে,
হেমন্ত দেয় তার আভাস
এই পৃথিবীতে।
এমন সময় শীত এসে
মনটা হরণ করে,
ঠিক যেমন চাতক পাখি
জলের আশায় মরে।
বসন্ততে গাছের পাতা
অবিরাম ঝরে,
এটাই কি ভাই বাঁধা নিয়ম
রকৃতির তরে।
যাই হোক তাই হোক
এ সবের শেষে,
নতুন এক বসুন্ধরা
আবার আসে ভেসে।

স্বপ্নের বিহঙ্গ

শতাব্দী বৈরাগী,
তৃতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স

আমি যদি হতেম একটি পাখি
সুন্দর পৃথিবী দেখার থাকত না বাকি।
উড়ে উড়ে যেতাম স্বপ্নের দেশে
কোনো এক রাজপক্ষীকে ভালোবেসে।
ভেসে বেড়াতাম আনন্দের সাগরে
বিশ্রাম নিতাম সবুজ ঘেরা পাহাড়ে।
নীল-সমুদ্রের জলরাশির উপর
খেলা করতাম সারা সকাল দুপুর।
বিকেলে লাল সূর্যের উজ্জ্বল রঙে
দু'জনায় ভাসতাম সুখের গাঙে।।

আমির সাথে

সুস্মিতা দাস, তৃতীয় বর্ষ

একলা আমি ছাদের পরে
আকাশ নীলের তলে,
একলা আমি দূর সাগরে
অতল গভীর জলে।
একলা আমি চাঁদের দেশে
চরকাবুড়ির পাশে,
একলা আমি নিরুদ্দেশে
পথের ধূলায়, ঘাসে।
একলা আমি বায়ুর সাথে
চাঁপার চাপা গন্ধে
একলা আমি বিকেলবেলার
কোকিল কুহু ছন্দে।
একলা আমি গানের সুরে,
রবি ঠাকুর সাথে,
একলা আমি স্বপন তরী
মন খারাপের রাতে।
একলা খোলা মেঘের গায়ে
ঘন শ্রাবণ ধারায়,
একলা রবির কিরণেতে
খোলা জানালায়।
শূন্য তরী, নেই সওয়ারী
একলা তীরে মাঝি—
একলা 'আমি' ছিলাম; আজও
'আমি'র সাথেই বাঁচি।

মানুষ

দেবব্রত বিশ্বাস,
প্রথম বর্ষ

মানব জনম পেয়েছি যখন
মানুষ হওয়ার লক্ষ্য তখন
অমানুষদের মানুষ করে
মানবিকতাকে কাছে টেনে
দুঃখ জ্বালা দূরে ফেলে
কঠোর পরিশ্রম করে
দাঁড়াতে হবে নিজের পায়ে
দেখিয়ে দেব জগতটাকে
বীরের মতো মুখটি তুলে
স্বাধীনতা দেব সবাইকে
সমস্ত ত্যাগ স্বীকার করে।

সমাজচিত্র

পল্লব ঘোষ
বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ

সমাজে রয়েছে কত স্বপ্ন লুকানো—
কিন্তু সেসব কী পারে সব প্রকাশ পেতে?
কেউ কাঁদে হাহাকারে— কেউ বা হা হা করে
কেউ মরে পরিশ্রম করে— কেউ আরাম করে।
এখনও যায়নি চলে শিশু শ্রমিক, নারী নির্যাতন
অবহেলা মানুষের প্রতি।
কঠোর আয়াসে জোগাতে হয় একমুঠো ভাত
একটু নুন তাদের।
কেউ করে না সম্মান তাদের, করে কি তাদের সঙ্গে
একটু আলাপ-ভালো ব্যবহার?
সমাজ তাদের দিকে পিছু ফিরিয়ে চলে
অন্ধ হয়ে যাই তখন মানবধর্ম—
বন্ধ হয়ে যাই সমাজের নেতাদের বুলি।
কে কি ভেবেছে তাদের কথা?
যদি করে চুরি পেটের জ্বালায়—
চাবুক মারতে ব্যস্ত সবাই।
কখনও কি একথা উঠে, 'সে অনাথ, অনাহার—
ছেড়ে দাও তাকে!'
হায়রে এ সমাজ!
যুগ-যুগ ধরেই বেড়েই চলেছে,
কালোবাজারি-অসৎ মানুষের দল।
ভেঙে পড়েছে অসহায়, নিপীড়িত শিশুর দল।
তাদের মুখের অন্ন কেড়ে খাচ্ছে কত-শত প্রাণ—

পাকিস্তান বিভাজিত হলো যবে
এই সমাজ পেলো দল।
তারা শিখে নেওয়া পেতো উপায়,
তারা কোথায় থাকবে খাবার।
তখন সমাজ তাদের দিতো যাদের জন্য মন,
কিন্তু সেটা কি আছে তাদের জন্য কোথায়?
তারা কেন একা হয়েছে?
যদি সেটা আমাদের, তাহলে থাকত না সমাজে—
বঞ্চিত অবস্থা
দারিদ্রসীমা,
থাকত না সমাজে হীন, আর্থসামাজিক খাদ্য-খাওয়া মানুষের সংখ্যা।
আজ সমাজে অন্যান্য পরিবারে,
সমাজে স্বল্পকালীন লোকের সংখ্যা বাড়ছে অনেক,
কারণই সমাজের উন্নয়ন।
অবশেষে আমরা এক সুরে বলবো—
'এই লোকের সমাজ, লোকের গৌরব।'

"আমাদের বই পড়তেই হবে, কেননা বই পড়া ছাড়া সাহিত্য চর্চার উপায়ান্তর নেই, ধর্মের চর্চা মন্দিরের বাহিরে করা চলে, দর্শনের চর্চা গুহায়, নীতির চর্চা ঘরে এবং বিজ্ঞানের চর্চা যাদুঘরে; কিন্তু সাহিত্য চর্চার জন্য চাই লাইব্রেরী। যে চর্চা মানুষ কারখানাতেও করতে পারে না, চিড়িয়াখানাতেও নয়।"

— 'বইপড়া', প্রমথ চৌধুরী

গল্প

উত্তরণ

সমাধান শিকারী

(অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ)

পাশের বাড়ির চিৎকারে সকালবেলা ঘুম ভেঙে মেজাজটা খারাপ হয়ে যায় অনুরাধার। প্রত্যেকদিনের এই ঘুমভাঙানিয়া পাড়াকীর্তনে ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে বাড়ির সকলে। অবসরপ্রাপ্ত বাবার অবশ্য এতে কিছু যায় আসে না। তার বাড়িতে বসে সময় কাটতে চায় না, সকালবেলার এই কীর্তনে তার মন চনমনে হয়, কিন্তু রাত জেগে পড়াশোনা করে সকালের ঘুম ভালো না হলে দিনটাই ভালো যেতে চায় না।

মালা পড়তে এলে ওর কাছ থেকে শোনা যায় বাবার চিৎকারের কারণ। ওর বাবাকে ওদের অঞ্চলে সকলেই 'টক-টমাটম' বলে চেনে। এরকম নামের অবশ্য কোন কারণ আজও কেউ জানতে পারেনি। পেশায় নাপিত এই 'টক-টমাটম' নিজের অঞ্চলের প্রত্যেকটি শ্রাদ্ধবাড়িতে হাজির হয়। সে কেউ ডাকুক বা না ডাকুক। কেউ অবশ্য তাকে ফিরিয়ে দেয় না। তার যা প্রাপ্তি ঘটে তাতে দশ দিনের খোরাক হয়ে যায়।

স্বচ্ছল পরিবারের মেয়ে না হলেও খাওয়া পরাতে কোন অসুবিধা হয় না মালাদের। এইরকম নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে হয়েও মালা কিন্তু স্কুলের দিদিমণিদের চোখের মণি। প্রতি বছর তার অসাধারণ রেজাল্ট প্রথম স্থান অধিকার করে মালা সকলের মনের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। অথচ মালা নিজের বাবা মনে কোন জায়গা আজও করতে পারেনি। মালাকে পড়তে বসতে দেখে বাবা চিৎকার করতে থাকলে সে কাঁদতে থাকে। সামনে মাধ্যমিক পরীক্ষা। নিয়মিত পড়াশোনা না করলে ভালো রেজাল্ট করা যাবে না। কিন্তু তার বাবা মালাকে পড়তে দেখলেই চিৎকার করে বলে — "মেয়ে মানুষের অতো পড়াশুনা করে কি হবে?" মাঝে মাঝে তো বই-পত্র ছুঁড়েও ফেলে দেয়। ভবিষ্যতে বড় হবার স্বপ্ন চোখে নিয়ে মালা কখনো কখনো নির্বাকহয়ে তাকিয়ে থাকে আকশের দিকে। আর ভাবে মেয়ে বলেই কি বাবার আমার ওপর এত রাগ! ভাইয়ের প্রতি বাবার অপার স্নেহ মালাকে

আরও বেশি কষ্ট দেয়। মনকে শক্ত করে মালা।

মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছয়টি লেটার পেয়ে পাশ করে মালা। এখন সে দ্বাদশ শ্রেণীতে। বাবার কাছে পড়াশোনার জন্য হাতখরচ সে আর চায় না। নিজেই টিউশন পড়িয়ে পড়ার খরচ চালায়। উচ্চমাধ্যমিকেও ভালো ফল করতে হবে। তাই ছাত্রছাত্রীকে পড়ানোর মাঝে মাঝে নিজেও বই-এ চোখ বোলায়।

খবরটা শুনে মালা একেবারে ভেঙে পরে। বাবা তার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। মালা অনেক কান্নাকটি করে, বাবার পায়ে ধরে, মাকেও বলে সে এখন বিয়ে করতে চায় না। কিন্তু মায়ের কোন কিছুই করার নেই। পিতামাতাহীন মাধুরী নিজের স্বামীর চক্ষুশূল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সামনে মালার বিয়ে হয়ে যায় এক ধনী পরিবারের পুত্রের সঙ্গে।

শ্বশুর বাড়িতে পা রেখেই মালা বুঝতে পারে অর্থের অভাব এ বাড়িতে নেই। চাকর-চাকরাণী, রাঁধুনি সবই আছে। মালা মনে মনে ভাবে আমি পড়াশোনা করলেও তাহলে এদের কোন অসুবিধা হবে না। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাটা সে দেবে। অষ্টমঙ্গলা থেকে বাড়ি ফিরে এসে দেখে বাড়িতে কোন কাজের লোক নেই। বাড়িতে বৌ এসে গেছে বলে শাশুড়ি সব কাজের লোক ছাড়িয়ে দিয়েছে।

এখন বাড়ির সব কাজই মালাকে করতে হয়। সকালবেলা উঠে বাইরের কাজ সেরে রান্নাঘরে ঢুকতে হয় মালাকে। শ্বশুর মশাই সকাল সকাল চা খান। একটু অন্যথা হলে শাশুড়ির চিৎকার শুরু হয়ে যাবে। রান্নাঘর থেকেই শোনা যায় — "সাধ করে তো ছেলের বৌ এনেছো, সাতটা তো বেজে গেল, চা কোথায়? আমি হেঁসেলে থাকলে এরকম হতে দিতুম না।" মালার বর রমেন ওঠে আটটার সময়। তাকেও চা দিতে হয়। এরপর জলখাবার। কাজ করতে করতেই সারাটা দিন কেটে যায়। বই নিয়ে বসার সুযোগই হয় না। মালা মনে মনে কষ্ট পায়। কাউকে বলতে পারে না। বরও সারাদিন ব্যবসা ছাড়া আর কিছু বোঝে না। আসলে বাড়ির সবাই লক্ষ্মীর পূজারী, সরস্বতী এদের কাছে গুরুত্ব পায় না। সন্ধ্যার সময় যখন পড়তে বসবে বলে ঠিক করে মালা, তখন তার শাশুড়ি এসে বলে — "বৌমা রুটিগুলো তৈরী করে নাও।" সবার যখন পড়ার সময় তখন মালাকে রুটি করতে হয় চোখের জল ফেলতে ফেলতে।

মালার এই পড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ির কেউই ভালোভাবে নেয় না। মালার বর রমেন এ জন্য তাকে মাঝে মাঝে মারধোরও করে। বাড়ির সবাই যখন ঘুমিয়ে পরে তখন নিশুতি

রাতে পড়তে বসে মালা। এইভাবেই পড়াশোনা করে মালা উচ্চমাধ্যমিকে সবকটি বিষয়ে লেটার মার্কস নিয়ে পাশ করে। সে পড়া চালিয়ে যেতে চায়। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা স্বামী নিজের চেয়ে বৌ বেশী শিক্ষিত হবে তা সহ্য করতে পারে না। রমেনও মালার পড়াশোনার পরিপন্থী হয়ে পড়ে। মালাকে শোনায় — "পড়াশোনা করবে তো বিয়ে করেছিলে কেন?" এইরকম পরিবেশ মালাকে আষ্টেপিষ্টে জড়িয়ে ধরে। দম বন্ধ হয়ে যায়। বাঁচার কোন পথ খুঁজে পায় না সে।

বাড়িতে আজ লক্ষ্মীপূজা। শাশুড়িমা নিজে পূজার বাজার করে এনেছেন। সমারোহের কোন ঘাটতি নেই সেখানে। পুজোর কাজ সমস্তই শাশুড়ি মা করছেন। মালার সেখানে 'নো এন্ট্রি'। সন্ধ্যাবেলায় ঠাকুরমশাই যখন পুজো করতে এসেছেন তখন মালা লক্ষ্য করল ঠাকুরের সামনে একটি মাত্র পাত্রে নৈবেদ্য ও ফল দেওয়া হয়েছে। শাশুড়ি মাকে জিজ্ঞাসা করলে সে উত্তর দেয় — "ঠাকুর কি অতো খাবে? আমরাই তো খাবো, বেশী দিয়ে কি হবে?" এই কথা শুনে মালা স্তব্ধ হয়ে যায়। সরস্বতী পুজো করতে চেয়েছিল বলে শাশুড়িমার অবাক হয়ে যাওয়ার কথা মনে পড়ে যায় মালার। আজ রাতে মালার সঙ্গে পড়ার কথা নিয়ে রমেনের সঙ্গে বেশ বাড়াবাড়ি রকমের ঝগড়া হয়। শেষ পর্যন্ত গায়ে হাত দিতেও রমেন দ্বিধা বোধ করে না।

সেদিন সারা রাত মালা ঘুমাতে পারেনি। জানি না কেন ইন্দ্রজাল সেদিন মালার চোখ বন্ধ করতে দেয়নি। পরের দিন সকালবেলা উঠে মালা যথারীতি সমস্ত কাজ করে শ্বশুরমশাইকে চা দিয়ে ছাদে যায়। দোতলা বাড়ির ছাদ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে মালা। প্রচণ্ড আওয়াজে সবাই ছুটে গিয়ে মালাকে রক্তাক্ত অবস্থায় পায়। অর্থের অভাব না থাকায় হাত-পা ভাঙলেও কোলকাতার বড় বেসরকারী হাসপাতাল থেকে পায়ে প্লেট বসিয়ে শীঘ্রই বাড়িতে আনা হয় মালাকে। শাশুড়িমা এবার তাকে বলে — "বউমা এবার আমাদের নাতি-নাতনীর কথা ভাবো। পাড়ায় যে আর কান পাতা যাচ্ছে না। সবাই বলছে রমেনের বৌ বাজা নাকি? ওর ছেলেপুলে হবে না।"

মালাকে বাধ্য হয়েই 'কনসিভ' করতে হয়। ইতিমধ্যেই বাড়ির কাউকে না জানিয়ে স্কুলের দিদিমণির সহায়তায় সে কলেজে প্রথম বর্ষে ভর্তি হয়েছে। কলেজে ক্লাস করতে যেতে না পারার যন্ত্রণা মালাকে কুড়ে কুড়ে খায়। তার ওপর আসন্ন সন্তানের কথা ভাবলে কোন দিশা খুঁজে পায় না মালা।

সদ্য একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিয়েছে মালা। বংশপ্রদীপ পেয়ে শশুর বাড়ির সকলে উল্লসিত। মালা কিন্তু খুশী হতে পারেনি। সে চেয়েছিল তার যেন একটি কন্যাসন্তান হয়, যাতে সে মনের মত করে মানুষ করবে। অন্ধকার তাকে যেন গ্রাস করতে না পারে। তবুও ছেলের প্রতি মমতায় কোন ঘাটতি রাখে না মালা। কিরণ এখন আট মাসের হল। মালা ওর বান্ধবীর কাছে জানতে পারে আগামীকাল তার পরীক্ষার ফর্ম ফিলাপের শেষ তারিখ।

সকালের সোনাঝরা রোদ আলোর আলোর হয়ে উঠেছে। শাশুড়িমা আয়েশ করে বসে চা খাচ্ছেন। মুখে নির্মল প্রশান্তি। মালা ছেলে কিরণকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢোকে। শাশুড়ি চা খাওয়া থামিয়ে হাত বাড়িয়ে আদরের নাতিকে কোলে নিতে চায়। মালা ঠাণ্ডা গলায় বলে — "নিন। আপনার নাতিকে ধরুন। এবার থেকে ওকে আপনিই দেখবেন। আমাকে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে।"

"মানে", শাশুড়ি অবাক হয়ে জানতে চান।

"মানে ছেলের বউ, নাতি — আপনার সমস্ত স্বপ্ন আপনার ... আর আমার কোন স্বপ্ন থাকতে নেই? ...আমি আবার কলেজে যাবো। পড়াশোনা শুরু করবো।"

মালা আর ফিরে তাকায়নি।

পিতৃত্বের টান

শিবনাথ ঘোষ

(দ্বিতীয় বর্ষ)

গোধূলিবেলায় পশ্চিম দিগন্তে ধাবমান সূর্যদেবতার তেজ যখন ক্ষীণ, কয়েক টুকরো মেঘ তার কাছে ভিড় জমিয়েছে, অপূর্ব দৃশ্য। কোনো অরমনীয় রমণী যেন সিঁদুর ছড়িয়ে দিয়েছে চারিপাশে। সেই অপূর্ব রক্তিম ম্লান আলোর ইউক্যালিপটাস গাছের তলায় মধ্যবয়সী পুরুষ ও মহিলা Making Love।

পুরুষটি তার বামহস্ত প্রসারিত করে মহিলাটির মাথা নিজের বক্ষের কাছে টেনে নিল। কারো মুখে কোন কথা নেই। সবকিছু স্তব্ধ। হঠাৎ স্তব্ধতা ভেঙে ফোন বেজে উঠল। পুরুষ পকেট থেকে ফোন বের করে কী ভেবে ফোনের 'সুইচ অফ' করে রেখে দিল।

মহিলা ঃ ফোনটা রিসিভ করলে না কেন লাল? কার ফোন ছিল? তোমার বৌ...?

লাল ঃ ছাড়ো না, আজ তুমি ছাড়া এই জগতে আমার কোথাও কেউ নেই, আচ্ছা এই কবিতাটা কেমন হয়েছে বলো তো?

হে সখী

তোমায়ে পেয়ে ধন্য জীবন মোর

আঁধার সন্ধ্যায় জীবন ভোর।

আমার জীবন সায়হ্নে-

(হঠাৎ অমৃতা হেসে উঠল। মহিলাটির নাম অমৃতা)

অমৃতা ঃ লাল তুমি কবিতা লেখো! জানতাম না তো?

লাল ঃ তুমি তো কিছুই জানো না, তোমায় কলেজে প্রথম যেদিন দেখেছি সেদিন থেকেই তোমাকে ভালোবাসি; এটাও তো তুমি জানো না।

অমৃতা ঃ কী করে জানবো, তুমি কী আমায় বলেছ?

লাল ঃ এখন তো জানো, চলো আমরা সব ছেড়ে অচেনা দেশে দিকশূন্যপুরের দিকে চলে যাই।

অমৃতা ঃ আর তা হয় না, আমি বিবাহিত আমার ছেলে আছে।

লাল ঃ তুমি আজও আমায় ভালোবাসো না।

অমৃতা ঃ না আমি তোমাকে ভালোবাসি। কিন্তু আমি বিবাহ নামক কারাগারে বন্দি। (হঠাৎ অমৃতার ফোন বেজে ওঠে)।

লাল ঃ অমিও তো বিয়ে করেছি। আমারও ৮ বছরের মেয়ে আছে। কিন্তু আমি তোমার জন্য সব ছাড়তে পারি...

(লালের কথা শেষ না হতেই অমৃতা ভীত কণ্ঠস্বরে বলে উঠল)

অমৃতা ঃ তোমার wife ফোন করেছিল; প্রিয়ার (লাল-এর মেয়ে) accident হয়েছে।

অমৃতার কথা শেষ না হতেই লাল অমৃতাকে নির্জন গলিতে একা রেখে দৌড়ল ট্যাক্সির পিছনে। সে পিছন ফিরে একবারও অমৃতার দিকে তাকাল না। এতক্ষণ আগে যার জন্য লাল জীবন পর্যন্ত দিতে পারত তার ভালোমন্দ বিচার না করে পিতৃত্বের টানে সে এখন ট্যাক্সির পিছনে প্রাণপনে ছুটছে... আর অমৃতা?

কী নাম দেবো এই গল্পের

বিক্রম বিশ্বাস
(প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

বিকাল থেকেই আকাশ জুড়ে শুধু কালো মেঘের আনাগোনা। বৃষ্টি শুরু হয়েছে মিনিট পনেরো হবে। শরতের শেষে অসময়ের বৃষ্টি। সত্যিই খুব বিরক্তিকর। রাস্তার পাশে একটা দোকানের ছাউনির নীচে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছিল অপূর্ব। হঠাৎ একটা বাস এসে থামল। একটা মেয়ে বাস থেকে নেমে সেই দোকানের নীচে দাঁড়াল। লাল সালোয়ার পরা মেয়েটা অপূর্বর চোখে খুব সুন্দর লাগছিল। ভিজে চুলে লাল সালোয়ার পরিহিত মেয়েটির দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখছিল সে। পাশে এসে দাঁড়াল বটে কিন্তু যেচে কথা বলতে অপূর্ব লজ্জাবোধ করল। বৃষ্টির দাপট ক্রমশঃ বেড়েই যাচ্ছে। অথচ বিকাল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল কিন্তু কমার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। দুজন দুদিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি থামার অপেক্ষা করছে। মেয়েটার কণ্ঠ থেকেই প্রথম কথা এল। অপূর্বর কাছে এগিয়ে এসে হাত দিয়ে কপালের চুলটা সরিয়ে শান্ত গলায় বলল, "আমায় একটা হেল্প করবেন? সন্ধ্যা হয়ে গেছে তাই যদি বাড়ি পৌঁছে দিতেন খুব ভাল হয়।"

অপূর্বর কাছে আজ পর্যন্ত এভাবে কোন মেয়েই হেল্প চায়নি বা হেল্প করার মত সৌভাগ্যও তার হয়নি। তাই বেশ একটু অপ্রস্তুত হয়েই সে বলল, "হ্যাঁ অবশ্যই, বৃষ্টি কমলে নিশ্চয়ই আপনাকে পৌঁছে দেব।" কিছুক্ষণ পর যখন বৃষ্টি থামল, তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এসেছে। মেয়েটিকে নিয়ে অপূর্ব তার বাড়ির পথে এগিয়ে দিতে গেল। যেতে যেতে মেয়েটির কথা সব শুনল অপূর্ব। নাম নন্দিনী। স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে সবেমাত্র কলেজের আঙিনায় পা রেখেছে সে। ভর্ত্তি হয়েছে সংস্কৃত অনার্স নিয়ে। বাড়িতে মা-বাবা ছাড়া তার ছোট একটা বোন আছে। ফর্সা সুশ্রী মুখের দিকে তাকিয়ে একভাবে কথাগুলো শুনছিল অপূর্ব। সেও তার সম্বন্ধে জানাল মেয়েটিকে। অপূর্ব বোটানি অনার্সের ২য় বর্ষের ছাত্র। সে বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। দু'জনে কথা বলতে বলতে কখন যে বাড়ি পৌঁছে গেল বুঝতেই পারল না কেউ। গেট খুলে ঢুকে নন্দিনী তাকে থ্যাঙ্কস্ জানিয়ে বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। অপূর্ব এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে ছিল যতক্ষণ না অদৃশ্য হয়। মনে মনে ভাবল এরকম সুন্দর মেয়েকে সাহায্য করতে পেরে সে সত্যিই খুশি।

বাড়ি ফেরার পথে অপূর্ব বুঝতে পারল তার বার বার মনে হচ্ছে নন্দিনীর কথা। যাকে সে চেনে না, আগে দেখেওনি কোনদিন। অথচ একটু আগে এই সামান্য কিছুক্ষণের আলাপে মনে হচ্ছে সে যেন তার অনেক দিনের চেনা। বার বার শুধু ঐ মেয়েটার কথাই মনে পড়ছে তার। কথাগুলোও যেন তার কানে বাজছে। সে কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না কেন তার এমন হচ্ছে? রাত্রে সবাই যখন শুয়ে পড়ল অপূর্বও ঘুমাতে গেল। শুয়ে এপাশ ওপাশ করল বটে কিন্তু তার ভাল ঘুম আসল না। ঐ সুন্দর মেয়েটার মুখ এখনো যেন তার চোখের সামনে ভাসছে। কী হচ্ছে? কেনই বা হচ্ছে? এসব কিছুই বুঝতে না পেরে যখন সে তার বন্ধুদের জানাল তখন বন্ধুরা হেসে বোঝাল। কিছু নয় বস, লাভ অফ ফাস্ট সাইট। এটাই তোর জীবনে সত্যি হয়ে গেছে, তুই লেগে থাক। হয়ে যাবে, চাপ নিবি না একদম। বন্ধুদের কথাও অপূর্ব ভাল বুঝতে পারল না। শুধু এটুকু বুঝল এখন তার মন চাইছে একবার নন্দিনীকে দেখতে। তাই বিকালবেলায় বাস রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু হঠাৎ তার খেয়াল হল আজ তো রবিবার। তাই হতাশ হয়েই ফিরে এল বাড়িতে।

পরের দিন যখন দেখা হল তাদের তখন সর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে।এক ঝাঁক সাদা বক আকাশে উড়ে যাচ্ছে। হঠাৎই অপূর্বর চোখ পড়ল নন্দিনীর দিকে। আবছা অন্ধকারে একটা প্রতীয়মান মূর্তি তার দিকে এগিয়ে আসছে।কাছে গিয়ে প্রথম কথা অপূর্ব বলল। "তোমার সাথে একটা কথা ছিল নন্দিনী। সেদিনের পর থেকে আমি শুধু তোমার কথাই ভাবছি, সারাক্ষণ শুধু তোমাকেই মনে পড়ছে; জানি না কেন এমন হচ্ছে।" এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে চুপ করে রইল অপূর্ব। নন্দিনীও লজ্জায় মাথা নীচু করে রইল। মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না সে। বাড়ি এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারংবার নিজেকেই দেখছিল নন্দিনী। তার মনে হল সত্যিই। এতদিনে ছেলেটার কথাও কিন্তু সে কমবার ভাবেনি। বহুবার ভেবেছে। কিন্তু সেও এটা কিছুতেই বুঝতে পারল না যে দুদিন আগেও যাকে চিনত না তার কথা সে কেন এতবার ভাবছে? কেন তার বার বার মনে হচ্ছে এটা লাভ অথবা এট্রাক্শন? বান্ধবীদের সাথে যখন বিষয়টা পরামর্শ করল বান্ধবীরা জানাল, "একবার তোকে দেখেই যখন ওর এই অবস্থা তখন নিশ্চয়ই তোকে ভালো লাগে। কিন্তু ছেলেটাকে না জেনে বুঝে বেশি এগোস না।"

এরপর অপূর্ব নন্দিনীর সাথে দেখা করল নির্জন নিস্তব্ধ নদীর ধারে। এখন পশ্চিমাকাশ লাল হয়ে উঠেছে। নদীর জলে সূর্যের লাল আশোকবর্ণ এখনও প্রতিফলিত হচ্ছে। অপূর্ব হাতে সেদিন একটা গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছিল। দু'জনে নিশ্চুপ থাকার পর প্রথম কথা অপূর্বই বলল। ফুলটা তার দিকে এগিয়ে দিয়ে অপূর্ব বলল তার মনের কথা। "আমি

তোমাকে ভালোবাসি। আমাকে ফিরিয়ে দিও না।" পূব আকাশে তখন সন্ধ্যাতারাটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলছে। ফুলটা নিয়ে লাজুক হয়ে মাথা নীচু করে রইল নন্দিনী। তারপর মৃদু স্বরে জবাব এলো, "এতদিন আমারও সন্দেহ ছিল এটা লাভ না এট্রাকশন? আজ সেই সন্দেহটা দূর হলো। সত্যিই আমি বুঝেছি এটা লাভ।

সত্যিই তারা একে অপরকে ভীষণ ভালোবাসে। কেউ কাউকে এক মুহূর্ত না দেখে থাকতে পারে না। অপূর্ব আর নন্দিনী। একই সাথে কলেজে যায়, বেড়াতে যায়, এমনকি নন্দিনী টিউশন পড়তে গেলেও অপূর্ব যায়। কীভাবে যে তারা দু'জন দু'জনার এত কাছে চলে এলো নিজেরাও বুঝতে পারল না। এভাবে হাসি-কান্নার মধ্য দিয়ে ভালোই কেটে যাচ্ছিল দু'জনের। কিন্তু গোলাপের কাঁটার মত তাদের ভালোবাসার পথেও কাঁটা সৃষ্টি হল।

আজ চারদিন হল নন্দিনী কলেজে আসছে না। ও তো কখনও কামাই করে না। তবেকী ওর শরীর খারাপ হয়েছে? এই চার দিনেই যেন মনে হচ্ছে চার মাস দেখা হয়নি। তবে কী একবার যাব নন্দিনীর বাড়িতে? বিষন্ন মনে কথাগুলো চিন্তা করছিল অপূর্ব। কিন্তু আসল খবর সে জানল তার এক বান্ধবীর কাছ। একটা সুপাত্রের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হচ্ছে নন্দিনীর। ছেলে বিলেত ফেরত ডাক্তার। খবরটা শুনেই যেন মাথায় বাজ পড়ার মতো চমকে উঠল অপূর্ব। তাহলে কী সব শেষ হয়ে যাবে? নন্দিনীকে সে কী চিরদিনের মতো হারাবে? যতই ভাবতে লাগল ততই অস্থির হয়ে উঠল সে। তাহলে এখন উপায়? কী করবে? অপূর্ব কিছুই বুঝতে পারল না। সে শুধু এটুকু জানে, নন্দিনীকে ছাড়া এক মুহূর্ত বাঁচতে পারবে না, মরে যাবে সে। কিন্তু কীই বা করবে সে? এখনো নিজের পায়েই দাঁড়ায়নি। নন্দিনীকে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করবে? বাড়ির অবস্থাও ভালো নয়। নন্দিনীকে সে কোনমতেই কষ্ট দিতে পারবে না। এভাবে অনেক ভেবেচিন্তে সিদ্ধান্ত নিল যাই হোক, পালানো ছাড়া আর কোন রাস্তা নেই। কারণ নন্দিনীকে ছাড়া সে মরেই যাবে। কিন্তু নন্দিনী? নন্দিনী কী রাজি হবে? প্রশ্নটা মনে হতেই তার শরীরে একটা শিহরণ খেলে গেল।

বিয়ে ঠিক হওয়ার পর থেকে বড় মন খারাপ মেয়েটার। কী করবে সেও বুঝে উঠতে পারছে না। তবে কি সবকিছু বাড়িতে জানিয়ে দেবে সে? কিন্তু তাতেও খুব একটা লাভ হবে না। কারণ একবার বাড়ি থেকে যেখানে কথা দিয়েছে জীবন থাকতে সে কথা নড়চড় হবে না সে খুব ভালো মতো জানে। তাহলে এখন উপায়? অপূর্বর সঙ্গে পালানো ছাড়া তার কাছে তো আর কোন রাস্তা নেই। কিন্তু তার বাবা-মা? তারা তো কষ্ট পাবে, মুখে চুনকালি দেবে লোকে। যারা ছোট থেকে তাকে কোলেপিঠে করে মানুষ করল এতটা দুঃখ

কী সে তাদের দিতে পারবে? কিন্তু অপূর্ব! ওকে ছাড়াই বা আমি বাঁচবো কি করে? না... নন্দিনীর অজান্তেই শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে এল। কথাটা ঘরে প্রতিধ্বনিত হল বারংবার। নন্দিনী মনস্থির করে ফেলেছে যত কষ্টই হোক বাবা-মাকে সে কখনো দুঃখ দিতে পারবে না। নিজের ভালোবাসাকেই সে বিসর্জন দেবে। কালকেই অপূর্বকে সব জানিয়ে দেবে। অপূর্বর চোখে চোখ রেখে নিষ্ঠুর কথাগুলোর বলার সাহস নেই নন্দিনীর। ঠিক করল যতটা সম্ভব এড়িয়ে চলার।

অপূর্ব লক্ষ্য করল, নন্দিনী তার সাথে কথা বলছে না। পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। কোন পাত্তাই দিচ্ছে না।

"কেন তুমি আমার সাথে কথা বলছ না? কী দোষ করেছি আমি?" বেশ কয়েকদিন প্রশ্নগুলো করেও ব্যর্থ হল অপূর্ব।

প্রায় এক মাস কেটে গেছে। অপূর্ব কলেজের বারান্দায় বসে এক মনে কী ভাবছে, হঠাৎ একটা চিঠি পেল। নন্দিনীর চিঠি। তার বান্ধবী এসে দিয়ে গেল।

"আমার বাড়ি থেকে বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। যত সম্ভব পারো আমাকে ভুলে যাও। আগামী পরশু আমার বিয়ে। এরপরও যদি আমাকে বিরক্ত কর বা আমার সাথে দেখা কর তাহলে আমার মরা মুখ দেখবে।" — নন্দিনী।

চিঠিটা পড়ে বাকিটাক্ষণ স্থির বসে রইল অপূর্ব। গভীর রাতে সবাই যখন ঘুমে আচ্ছন্ন তখন একটা কাগজ নিয়ে লিখতে বসল সে। লেখা শেষ হলে কাগজটা টেবিলের উপর রেখে দিল।

পরদিন সকালে অপূর্বকে ডেকে ডেকে কোন সাড়াই পাওয়া যাচ্ছে না। এত বেলা পর্যন্ত ছেলেটা কখনো ঘুমায় না তো, বলল অপূর্বর মা। প্রতিবেশীরা যখন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকল ততক্ষণে অনেক দেরী হয়ে গেছে। খবর পেয়ে নন্দিনী ছুটে অপূর্বর বাড়িতে এল। দেখল সিলিং ফ্যান থেকে অপূর্ব ঝুলছে। পা দুটো শূন্যে আর টেবিলের উপর রাখা একটা চিঠি। কাঁপা হাতে চিঠিটা নিয়ে নন্দিনী পড়ল—

ভুলাতে পারি তোমায় আমি যেদিন যাব চলে।
এই পৃথিবী ছেড়ে যাব নীল আকাশের কোলে।।
ভাববে সেদিন আপদ গেল বেশ হয়েছে যাক।
জ্বালাতনের পাগলটা আজ নীল আকাশেই থাক।।

— অপূর্ব।

শেষ উপহার

চন্দ্রা ঘোষ (প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

— "তাহলে তুমি সত্যিই বিদেশে যাচ্ছ?"

বসন্ত কেবিনে বসে চা খেতে খেতে অর্ণাভ জিজ্ঞাসা করল নবনীকে। নবনী একটু ম্লান হেসে বলল, "হ্যাঁগো যেতেই হচ্ছে। এত বড় সুযোগ যখন এসেছে... আর বাড়িতেও বাবা মায়ের সাপোর্ট পেয়েছি।"

— "ভালো"। বলল অর্ণাভ। একটু চুপ করে থেকে আবার বলল, "তবে বিদেশে গিয়ে আমাকে ভুলে যাবে না তো? ফিরে এসে আমাকেই বিয়ে করবে তো?"

— "কি যে বলো! তোমায় ভুলে যাবো? এতদিনে আমাকে এই চিনলে!" এরপর অর্ণাভ নবনীর বাঁ হাতের ওপর নিজের ডান হাতটা রেখে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করে রইল।

নবনী চ্যাটার্জী আর অর্ণাভ সেনগুপ্ত দু'জনেই প্রেসিডেন্সী কলেজের জুলজির ছাত্রছাত্রী। নবনী সুন্দরী, বড়োলোকের মেয়ে। ভীষণ স্বাধীনচেতা, তবে উচ্ছৃঙ্খল নয়। সে সৎ ও নীতিবাদী। গ্রাজুয়েশন করে উচ্চশিক্ষার জন্য লণ্ডন যাচ্ছে। অর্ণাভ দেখতে সুপুরুষ, রক্ষণশীল, যৌথ পরিবারের ছেলে। ও যখন প্রথম নবনীকে দেখেছিল, তখনই ভালো লেগেছিল, কিন্তু নবনী পাত্তা দেয় না। পড়াশোনা নিয়েই থাকতো। অর্ণাভ ভাবতো এতো অহংকার কিসের? কোন দিকেই তো সে খারাপ নয়। দেখতেও ভালো। তখনই ঠিক করেছিল, যে করেই হোক ঐ মেয়েটার মন জিততেই হবে। তারপর থেকেই সে প্রায়ই ক্লাসে গিটার নিয়ে আসত। অর্ণাভর গলা সত্যিই খুব ভালো। হয়ত তারই টানে নবনী কাছে এসে ঘন সুন্দর চোখ দুটি তুলে বলেছিল, "তুমি সত্যিই ভালো গান গাও।" তারপর থেকেই নবনী ওর সাথে কথা বলত। অতঃপর ভালোবাসা।

বসন্ত কেবিন থেকে বেরিয়ে নবনী বলল — "চলো না, গঙ্গার ধারে কোথাও নিরিবিলিতে বসি। একটা গান শোনাবে চলো। আমি তো চলেই যাচ্ছি।'

— "আজ আর গান গাইতে ইচ্ছা করছে না। তুমি ফিরে এসে তোমাকে সারা জীবন ধরে গান শোনাবো।"

— ঠিক তো?

— হ্যাঁ কথা দিচ্ছি।

নবনী লন্ডন চলে গেছে তিন বছর হল। আজ অর্ণাভদের বাড়িতে আত্মীয়-স্বজনের ভিড়। কারণ আজ তার জেঠতুতো দাদার বিবাহবার্ষিকী। আত্মীয়দের ভিড়ের মধ্যে একটা বছর কুড়ি বাইশের মেয়ে অর্ণাভকে আকৃষ্ট করেছিল। নিঃসন্দেহে মেয়েটি সুন্দরী। নবনীকে ভালোবাসার পর অর্ণাভ অন্য মেয়েদের দিকে খুব একটা তাকাত না। সে সময় সে নবনীর দুর্লভ হৃদয় জয়েই ব্যস্ত ছিল। কিন্তু দীর্ঘ অদেখায় প্রেমিক প্রেমিকার সম্পর্কে অনেক সময় অবনতি ঘটে। তাই কমলিকা নামে মেয়েটিকে দেখার পর থেকেই সে ভাবতে লাগলো, নবনীর থেকে এ কম কিসে!

কমলিকা, অর্ণাভের বৌদির দুর সম্পর্কের বোন। বি.কম পড়ছে। তেমন উচ্চাকাঙ্খী নয়। আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মত সেও স্বামী সংসারের স্বপ্ন দেখে। তার বাবা-মা তার জন্য সম্বন্ধও দেখছেন। এইরকম সময় অর্ণাভকে দেখে তাদের মনে হয়েছে কমলিকার জন্য সুযোগ্য পাত্র। এদের প্রস্তাবের কথাই অর্ণাভর মা সেদিন রাত্রে ছেলেকে জানালেন। অর্ণাভ বলল, ওর আপত্তি নেই। মা খুশি হয়ে চলে গেলেন। কারণ কমলিকাকে তারও খুব পছন্দ।

অর্ণাভ ভাবতে লাগলো, নবনী আর কমলিকা দুজনেই খুব সুন্দরী, কিন্তু কত অমিল। নবনী স্বাধীনচেতা উচ্চাকাঙ্খী। সেক্ষেত্রে অর্ণাভদের রক্ষণশীল পরিবারে ওকে সবার মেনে নিতে অসুবিধা হত। আর কমলিকা, তার সাথে আলাপ হয়ে অর্ণাভ যতটা বুঝেছে, সে নবনীর একেবারে বিপরীত। কমলিকার মত মেয়েদের সহজেই পাওয়া যায়, কিন্তু নবনীর মন পেতে অর্ণাভকে যথেষ্ঠ চেষ্ঠা করতে হয়েছিল। সেজন্য মনের কোণে কোথাও একটু ক্ষোভ জমা ছিল।

অর্ণাভ যখন কমলিকার চিন্তায় ডুবে যাচ্ছিল, অন্যদিকে বহু দূরে বসে বেচারী নবনী অর্ণাভর সাথে ঘর বাঁধার মিথ্যা স্বপ্ন বুনছিল।

আজ অর্ণাভ আর কমলিকার ফুলশয্যা। অর্ণাভ অতিথিদের সামলাতে ব্যস্ত। তারই ফাঁকে সে মাঝে মাঝে এসে দেখে যাচ্ছে তার নববধূ সাজে সজ্জিত সুন্দরী বউকে।

অর্ণাভর বন্ধু ঋদ্ধিমান ওকে এক জায়গায় নিয়ে গিয়ে বলল — "অর্ণাভ, আজ যে মেয়েটা ওখানে বসে আছে, সেখানে কিন্তু নবনীর বসার কথা ছিল। তুই ওকে ঠকিয়েছিস।"

— ও যে আমায় ঠকাতো না, তা কেউ বলতে পারে না।

— মানে, এতদিন বিদেশে থেকে ওখানকার কোনো এক সাহেবকে হয় বিয়ে করে আনবে।

— বাজে কথা বলিস না। তোর আসলে ইগো প্রবলেম হচ্ছে। ও বিদেশ গেল পড়তে। তুই যেতে পারিসনি। তাই এই তো? মেয়েদের কবে তোরা সম্মান করতে শিখবি?

— ঝগড়া করিস না আজ। যা ওদিকটা দেখ।

— যাচ্ছি তবে শুনে রাখ, নবনী তোর কাছে ফিরে আসবে। ও তোর মতো বিশ্বাসঘাতক নয়।

অভিমান রেগে মেগে চলে গেল। এমন সময় অর্ণাভর পাড়ার এক বন্ধু এসে বলল — 'বাইরে একটা মেয়ে তোর জন্য অপেক্ষা করছে। কিছুতেই ভিতরে আসল না।'

অর্ণাভ বেশ অবাক হয়ে বাইরে গেল। মেয়েটিকে দেখে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ওর মুখ। যে ওর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, একদিন তার ভুবনমোহিনী হাসিতে মুগ্ধ হয়ে সব কিছু ভুলে যেত অর্ণাভ। আজ তার বদলে বিষন্ন গোধূলিবেলার ম্লান হাসি। যে দুচোখের গভীরে ডুবে যেত অর্ণাভ, সেখানে আজ সব হারানোর মূক যন্ত্রণা।

নবনী ধরা গলায় বলল, 'কদিন আগে ফিরে খবর পেলাম তোমার বিয়ে। তাই তোমার নতুন দাম্পত্য জীবনের জন্য শুভেচ্ছা জানাতে এলাম।'

— আয়্যাম সরি, নবনী।

— তোমাকে শুধু ভালোবাসতেই পারি, ক্ষমা করতে পারবো না। যাই হোক, আমি নিমন্ত্রিত নই। তাই কিছু আনতে সঙ্কোচ হল। তবে একটা কবিতা এনেছি। পড়ে দেখো।

নবনী একটা চিরকুট দিয়ে বলল — 'আর একটা কথা, তোমার বউকে কোনদিন কষ্ট দিও না। ওর বিশ্বাসটা রেখো। চিন্তা করো না তোমাদের মাঝে আমি কখনো আসবো না। চলি।'

নবনী মিলিয়ে গেল। দূর থেকে অনেক দূরে। অর্ণাভর জীবন থেকেও। চিরকুটটা খুলে দেখলো তাতে লেখা আছে—

কান্নাভেজা জীবনতটে
তুমি এলে ভেসে।
পাগল হল আকাশ-বাতাস
হৃদয় উঠলো হেসে।
সেই যদি বা ভেসেই যাবে
কেন এলে বৃথা,
এই নবনী থাকবে তোমার
থাকুক না সে যেথা।

রহস্যভেদ

অনুশ্রী দাস (দ্বিতীয় বর্ষ)

রসুলগঞ্জের সরকার বাড়ি। সবাই এক ডাকে চেনে। কিন্তু কেউ সেখানে যাওয়ার নাম করলেই সবাই আঁতকে ওঠে। সবাই বলে ওখানে নাকি ভুত আছে, কেউ যদি সেখানে যায়, আর সে ফেরে না। কিন্তু ব্যাপার হল আজ অবধি কেউ তাঁদের দেখেনি। সবাই সবার মুখে শুনেছে, তাঁদের নাকি বড় বড় দাঁত, বড় বড় চোখ, বড় বড় নখ — সে এক ভয়ানক চেহারা। আমিও সবার মুখে শুনেছি, শুনে একটু ভয় লেগেছিল। কিন্তু ব্যাপারটা বেশ রহস্যজনক বলে আমার মনে হয়েছিল। ছোটোবেলা থেকে মায়ের মুখে শুনে আসছি ভুত বলে কিছুই নেই। তাই একদিন সাহস করে আমার এক বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম রসুলগঞ্জের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে ছিল ধারালো ছুরি, দু'বোতল জল, কিছু খাবার ও একটি টর্চ ইত্যাদি। আমরা গিয়েছিলাম একরাতের জন্য। গাড়ি করে মাত্র তিন ঘন্টার পথ। শেষ পর্যন্ত পৌছলাম রসুলগঞ্জে। তবে আমরা ঠিক করলাম আমরা সরকার বাড়িতে থাকব না। সেখানে কম পয়সায় একটা ঘর ভাড়া নেওয়া হল। তখন বাজে বেলা চারটে। বাড়ি থেকে খেয়ে দেয়ে বেড়িয়েছি তাই খিদে নেই। একটু রেস্ট নিতেই চোখটা যে কখন বুজে গেছে বুঝতেই পারিনি। একটা সুন্দর স্বপ্ন দেখছিলাম, হঠাৎ ডাক শুনে চমকে উঠলাম, ঘুম ভেঙে গেল। বন্ধুর উপর প্রথমে একটু রাগ হয়েছিল কিন্তু যখন ঘড়িটা দেখলাম তখন বন্ধুকে ধন্যবাদ জানালাম। কারণ তখন বাজে রাত আটটা। যা কিছু এনেছিলাম খাবার জিনিস, সব খেলাম আমরা, তারপর জল খেয়ে ছুরি ও টর্চটা নিয়ে বেরিয়ে পরলাম সরকার বাড়ির উদ্দেশ্যে। সেখানে ঘটল এক অদ্ভূত ঘটনা।

তখন বাজে রাত সাড়ে নটা। আমরা তখন ঐ বাড়ির দরজার সামনে। দরজায় তালা দেওয়া। বাড়িটা ছিল খুবই পুরোনো। বাড়ির গা দিয়ে গাছ বেরিয়ে গেছে। চারিদিকে ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে, অমাবস্যার রাত, চারিদিকে অন্ধকার, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাড়িটাকে খুব ভালো করে দেখতে পারিনি। চারিদিকে বিভিন্ন শব্দ। আমার বন্ধুর তখন ভয়ে কাঁটা দিচ্ছে। আমরা আর সাহস করে তালা ভেঙে ভেতরে ঢুকতে পারলাম না। হঠাৎ আমরা শুনতে পেলাম কিছু মানুষের গলা ও হাসির শব্দ। হাসির শব্দ শুনে মনে হল কোন ভারী

মানুষের গলা। আমরা বাড়িটার চারিদিকে ঘুরতে লাগলাম যদি কোন জানালা খোলা থাকে তাহলে দেখবো। হঠাৎ সৌভাগ্যক্রমে একটা জানালা খোলা ছিল, সেই জানালা দিয়ে ভেতরে চোখ পড়তেই দেখলাম কিছু মানুষকে। তাদের গায়ের রঙ কালো, মুখে কালো কাপড় বাঁধা। শুধু চোখগুলো দেখা যাচ্ছে। তাদের পরনে ছিল কালো কাপড়। তারা পরিকল্পনা করছিল কোন এক জমিদার বাড়িতে হানা দেওয়ার জন্য। সব কথা শুনে মনে হল তারা আর কেউ নয়, ডাকাতদল। খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম সেই সময়ে। তাড়াতাড়ি থানায় গিয়ে জানাতেই পুলিশে সেখানে আসল এবং হাতেনাতে ধরল সেই ডাকাত বাহিনীকে। এতদিন পর্যন্ত সবাই জানত সেখানে ভুত আছে। সেখানে কেউ গেলে আর ফেরে না। আসলে যারা আগে সেখানে গিয়েছিল তারা সবাই ডাকাতের হাতে পড়ে মারা গেছে। এই রহস্য ভেদ করার জন্য এবং ডাকাতের হাত থেকে সেই গ্রামকে রক্ষা করার জন্য আমাদের সেই গ্রাম থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হল। আমরা সেই সাফল্য নিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

"বাঙ্গালা সাহিত্যে আর যাহারই অভাব থাকুক কবিতার অভাব নাই, উৎকৃষ্ট কবিতারও অভাব নাই — বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সুকবি বাঙ্গালায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেক উত্তম কবিতা লিখিয়াছেন, বলিতে গেলে বরং বলিতে হয় যে বাঙ্গালা সাহিত্য কাব্যরাশি ভারে কিছু পীড়িত।" — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ধৈর্য্য

নুরসেলিনা খাতুন
(বি.এ., দ্বিতীয় বর্ষ, বাংলা অনার্স)

যুগের দোষ হয় না, সময় পরিবর্তন হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের গঠন পাল্টায়। কিন্তু মনের সত্যতা যেমন পাল্টায় না, একইভাবে মনের ভিতরের আক্রোশভাবও অপরিবর্তিত থেকে যায়। প্রায়শই দেখা যায় বর্তমান সমাজে মানুষ নামক প্রানীর ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটছে। ঘরের মধ্যে, প্রতিবেশীর সঙ্গে, পাড়ায় পাড়ায় পথে-ঘাটে, সংবাদপত্রে, টিভির পর্দায় ধৈর্য্যচুতির ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে ওঠে।

নবজাত শিশুর হাতে তুলে দিতে যাচ্ছি উত্তপ্ত, বিশৃঙ্খল, সংস্কৃতিহীন এক পঙ্গু সমাজ। বাঙালি সমাজ ব্যবস্থায় 'ক্ষমা' শব্দের লোপ পেয়েছে। এর ফলে সমাজ আরও রসাতলে নিমজ্জিত হচ্ছে। ভালোবাসা, মানবিকতা, সহযোগিতা, সহিষ্ণুতা ও সততার অপমান দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। এরই বা কারণ কি? আসলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য ভুল বিষয়কে সঠিক প্রচারে করে উচ্চঃস্বরে চিৎকার, চেঁচামেচি করে সঙ্গে ক্ষমতা ও শক্তির প্রয়োগ করে। এর একমাত্র কারণ ব্যক্তি ধৈর্য্য সহ্যশক্তির ধারণ ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। ধৈর্য্যের অবনতি হলে মানুষ যে কত ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে তার কতকগুলি দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল। প্রেমিকা ভালোবাসে তার প্রেমিকের মনকে, জাতি ও বংশপরিচয়কে নয়। দুটি মনের মিলন সত্ত্বা ঘর বাঁধতে চাইলে উভয় পক্ষের বাবা-মা বংশ পরিচয়ের প্রশ্ন তোলে, ছেলের কর্মক্ষমতা ও রোজগার কেমন? এর ফলে দুটি মনের মিলন সত্ত্বার উপর বাঁধার সৃষ্টি হয়। এমন অবস্থায় পিতা পুত্রের কথা শোনে না, পুত্রও পিতার কথা শোনে না। পিতা বংশের আভিজাত্য আর পুত্র ভালবাসাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য পিতার গণ্ডিবদ্ধ জীবনকে অতিক্রম করতে চায়। ফলে কী ঘটছে পিতা-পুত্রের মধ্যে সংবাদপত্র, সংবাদ মাধ্যমে আমরা প্রায় দেখে থাকি। আবার এমনও ঘটে অন্য কোন ছেলের সঙ্গে নিজের প্রেমিকাকে শপিং মলে, বাসস্ট্যাণ্ডে, অনুষ্ঠান বাড়ি কিংবা পথে-ঘাটে দেখলে ছেলেটির সহ্য ধৈর্য্যের চ্যুতি ঘটে। পরিণামে আত্মহত্যা করার প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু নিজের প্রেমিকার সঙ্গে যে ছেলেটি ছিল সে কে? মেয়েটি

জানিয়েছে তার মামার ছেলে কিন্তু ছেলেটি বিশ্বাস করেনি।

স্কুল, কলেজ, স্যার, ম্যাডামের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীর তর্ক-বিতর্ক হলে ছাত্রছাত্রীরা ভুলে যায় শিক্ষকের অবস্থান। জ্ঞানশূন্য হয়ে শিক্ষকের গায়ে হাত তোলে।

আজকের দিনের বড় সমস্যা হল 'অ্যাসিড কাণ্ড'। ছেলেরা কেন অ্যাসিড ছোঁড়ে, আর মেয়েরা কেন অ্যাসিড ছুঁড়তে পারে না? মেয়েদের কি অ্যাসিড ছোঁড়ার হাত নেই, না সাহস নেই? পাঠক সমাজ কি ভাবছেন জানি না, তবে আমার মনে হয়, ছেলেরা প্রেম করে কিন্তু ভালোবাসে না। প্রেম করলে স্পর্শ থাকে আর স্পর্শ কখনো সম্মতি নিয়ে আবার কখনো সম্মতি ছাড়া হয়। সম্মতি ছাড়া প্রেমিকাকে স্পর্শ করলে প্রেমের মধ্যে চির থাকে। প্রেমিক প্রেমিকাকে তখন আরো কাছে পেতে চায়। আর প্রেমিকা ততই দূরে সরে যায়। প্রেমিক তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে প্রেমিকার ক্ষতি করার ছক কষে। তার একটা অবলম্বন অ্যাসিড ছোঁড়া। যদি ছেলেটি সত্যি ভালোবাসত, কখনই ভালোবাসার বস্তুটিকে নষ্ট করতে বা পুড়িয়ে ফেলতে পারত না। মেয়েরা প্রেম করে ও ভালোবাসে। প্রেমিকের সঙ্গে মনোমালিন্য হলে প্রেমিককে প্রত্যাখ্যান করে, তখনও তার ভালোবাসা মরে না, পবিত্র ভালোবাসা নষ্ট করতে ও খারাপ হতে দেয় না। মেয়েরা এই বোধ থেকে অ্যাসিড ছোঁড়া থেকে বিরত থাকে।

যান্ত্রিক সমাজে মানুষের জন্য মানুষ নয়, যন্ত্রের জন্য মানুষ। দিনের পর দিন পরিবার ছোট হচ্ছে, পরিবারের লোকজনের মধ্যে ধারণ করা ও সহ্য করার ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। তার উপর বিপুল সংখ্যক জনগণের মধ্যে থেকে নিজের প্রাপ্য অধিকার নিজেকে আদায় করার জন্য ব্যক্তি একা হয়ে পড়ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক, সামাজিক অসাড়তা ব্যক্তিকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। ফলতঃ ক্ষমা করা, মানবিকতা, সহযোগিতার জন্য হাত বাড়িয়ে দেওয়া, সহ্য করার ক্ষমতা, সত্যের প্রতি অবস্থান না রেখে চলা আর সবচেয়ে বড় কথা বিশ্বাস ও ভালোবাসা হারিয়ে ফেলা। বাঁচার জন্য স্বপ্ন আবশ্যিক। স্বপ্ন দেখতে হলে ভালোবাসতে হয়। হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসা ফিরিয়ে আনার জন্য কারও সাহায্য নয়, দরকার ধারণ ক্ষমতা আর সহ্য ও ধৈর্য্যের প্রতি আস্থা রাখা। এতটুকু সহৃদয় হলে আমাদের উপর আঙ্গুল তোলা বড় দায়ের বিষয়। বাঙ্গালীরা সমালোচনার জায়গা থেকে উঠে আসবে আলোচনায়। সেটা আমাদের বড় পরিচয় ও সভ্য জগতের দিকে অগ্রসর, জাতি সমাজ ও পরিবেশের গর্বের বিষয়।

কপালে লেখা

জয়শ্রী অধিকারী
(বি.এ., প্রথম বর্ষ, বাংলা অনার্স)

নবদ্বীপে গঙ্গার ধারে এক গ্রামের একজন ব্রাহ্মণ ও একজন ব্রাহ্মণী বাস করতেন। ব্রাহ্মণ বিদ্যা ও বুদ্ধিতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি প্রতিদিন প্রভাতে গঙ্গায় স্নান করতে যেতেন। একদিন ব্রাহ্মণ গঙ্গায় স্নান করতে গিয়ে দেখতে পেলেন যে, গঙ্গার ধারে একটা মরার মাথা পড়ে আছে। তার কপালে লেখা আছে মরে গিয়েও দুর্গতি আছে। তখন ব্রাহ্মণ ভাবলেন, আমি দেখবো এর কি দুর্গতি হবে? তখন ব্রাহ্মণ মরার মাথাটি বাড়ি নিয়ে এলেন। ব্রাহ্মণীকে কিছু না বলে একটি মেটে হাঁড়িতে করে সিকিতে ঝুলিয়ে রাখলেন। প্রতিদিন সকালে ব্রাহ্মণ ভিক্ষাতে যেতেন আর যাওয়ার আগে হাঁড়িটি খুলে দেখে যেতেন। ভিক্ষা করে বাড়িতে ফিরে এসে হাঁড়িটি খুলে দেখতেন। একদিন ব্রাহ্মণী ভাবলেন যে ব্রাহ্মণ রোজ ভিক্ষা করে এসে হাঁড়িটি খুলে কী দেখেন? তখন ব্রাহ্মণীর মনে সন্দেহ হল যে হাঁড়ির মধ্যে কী আছে? সিকে থেকে হাঁড়িটি খুলে দেখতে পেলেন যে, তার মধ্যে একটা মরার মাথা আছে। সে তখন ভাবল যে এই মাথাটা ব্রাহ্মণের কোনো ভালোবাসার মানুষের মাথা। সেই জন্য ব্রাহ্মণ মাথাটি যত্ন করে তুলে রেখেছেন এবং দিনে একবার করে দেখলেন। ব্রাহ্মণী ভাবল যে, ব্রাহ্মণ আজ ভিক্ষা করতে গেলেই আমি মাথাটার একটা ব্যবস্থা করবোই। ব্রাহ্মণ সেদিন ভিক্ষায় গেল এবং ব্রাহ্মণী মনে মনে ভেবে রেখেছিল যে ব্রাহ্মণ ভিক্ষায় গেলে মাথাটার একটা ব্যবস্থা করবে। তখন ব্রাহ্মণী মাথাটা পেড়ে এনে ঢেঁকিতে আচ্ছা করে ভেনে গুঁড়ো করে পায়খানার মধ্যে ফেলে দিল। ব্রাহ্মণী মনে মনে খুব আনন্দ পেল এবং ভাবল যে ব্রাহ্মণ এসে তার ভালোবাসার মানুষটির মাথা আর কোনদিন দেখতে পাবে না।

সারাদিন পরে ব্রাহ্মণটি ভিক্ষা করে বাড়ি ফিরে এসে দেখতে পেল যে মরার মাথাটি হাঁড়ির মধ্যে নেই। তখন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণীকে জিজ্ঞাসা করল যে, এর মধ্যে একটা মরার মাথা ছিল সেটি কোথায় গেল? ব্রাহ্মণী বললেন যে, তুমি রোজ ভিক্ষা করে এসে হাঁড়িটি খুলে কী দেখ? সেই জন্য আমি রেগে গিয়ে মাথাটি ঢেঁকিতে পিষে গুঁড়ো করে পায়খানার মধ্যে ফেলে দিয়েছি, যাতে তুমি আর কোনদিনই না দেখতে পারো। তখন ব্রাহ্মণ ভাবল যে, মরে গিয়েও মাথাটির কপালে এটাই দুর্ভোগ লেখা ছিল।

প্রাক্ শারদীয়া অনুষ্ঠান

সনাতন রায়

তারিখ যাই হোক, মন্দ ছিল না দিনটা। সকাল থেকেই অধীর আগ্রহে চেয়েছিলাম কখন সময় হবে কলেজে যাওয়ার। কারণ সেই দিনে ছিল আমাদের কলেজের প্রাক্ শারদীয়া অনুষ্ঠান। কোনরকম খাবার খেয়ে বেড়িয়ে পরলাম সকাল সকাল, রাস্তায় মনে পড়ল কলেজের রিহার্সালের সময়ের কথা, ভাবলাম পারবে তো আনন্দ দিতে আমাদের দাদা এবং দিদিরা আমাদেরকে, যারা আমারই মত দর্শক মাত্র। ভাবতে ভাবতে কলেজের মধ্যে ঢুকলাম। তবুও তেমন দর্শক বা ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতি লক্ষ্য করলাম না। একটু এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দিদিদের শাড়ী ও দাদাদের বাঙালিয়ানা পোশাক পড়ে মোটামুটি একটা প্রাক্ শারদীয়ার গন্ধে কলেজ প্রাঙ্গণ মোহ মোহ। ভাবলাম একটু ঘুরে আসি। দেখতে দেখতে সময় পার হয়ে এল, আগমনী গানের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগে সম্মানীয় শিক্ষক ও শিক্ষিকা মহাশয় ও মহাশয়াদের আদর মিশ্রিত ভালবাসা ও বক্তব্য এবং গানের সুরে মন চঞ্চল হয়ে উঠল। যেন আমি বাংলার সংস্কৃতির ছোঁয়ায় গর্বিত এক বাঙালির ছেলে। নিজে অবশ্য একটু দুঃখ অনুভব করলাম, কারণ আমার আজ বাঙালি পোশাক পরে আসা হয়নি। বাঙালি পোশাক পরে আসলে হয়ত আমার আরও একটু ভাল লাগত। যাই হোক সময় অতিবাহিত হলে সেই সময় আর ফিরে আসে না। শুধু প্রতীক্ষায় থাকতে হয় আগামী দিনে কিছু ভাল করার। মনের কল্পনায় দেখলাম আমিও আগামী অনুষ্ঠানে আমিও আছি এইরকম এক অনুষ্ঠানে। যাই হোক এবার প্রাক্ শারদীয়া অনুষ্ঠানের কথা বলা যাক—

শুরু হল গান ও কবিতা আবৃত্তি, নৃত্যগীতের মাধ্যমে এবং এরই মধ্যে দর্শকগণ আমারই মত মন খুলে আনন্দ উপভোগ করল এবং সাগ্রহে চেয়ে রইল অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণের দিকে। অনুষ্ঠানের পরিচালকগণের মুখে নাটকের নাম শুনে হাসি পেলেও সে হাসি কিছুই ছিল না যখন শেষ হল 'গাঁজা বাবার সংসার'। সত্যি বলতে গাঁজা বাবার সংসার নাটক দেখে হাসির বাঁধ ভাঙলেও তা অনেকটা বর্তমান বাঙলার অনেক ঘরের ঘটনা মাত্র। নাটকে গাঁজাবাবার নেশা হয়ত গাঁজা, আর সমাজের সাধারণ ব্যক্তির নেশা! সে

এক বৈচিত্র্যময় ভাটামুখী আশার মত।

পরবর্তীতে আরও একটি নাটক অনুষ্ঠিত হল। যার নাম 'ডাকাতের মা'। নানারকম ভাবনা ভাবতে ভাবতে শুরু হল নাটক 'ডাকাতের মা'। নাটক শেষ হওয়ার পর মনে হল অনেকে হয়ত মরু ডাকাতের মা নয়, তবুও এই রকম অভাগা মায়ের হয়ত এ বাংলাতে অন্তত অভাব নেই। এসব ভাবনার কথা বাদ দিলেও নাটকের অভিয়ের অসাধারণত্বের কথা ভাল বললে কমই বলা হবে। আর দর্শকদের কথা, সে আর বলতে, তাদের অধীর আগ্রহে ও উদ্দীপনায় অনুষ্ঠান ঘর মুখরিত ছিল সব সময় এবং তাদের সংখ্যা ছিল আমার আশাতীত।

নাটকের রিহার্সাল দেখতে গিয়েছি অনেকবার। রিহার্সাল দেখতে দেখতে ভেবেছি দাদা-দিদিরা পারবে তো ঠিক ঠিকভাবে দর্শকদের আনন্দ দিতে? কিন্তু অনুষ্ঠানে দাদা-দিদিরা যেভাবে অভিনয় করেছেন, তাদের অভিনয় দেখে আমার যে অনুভূতি হল তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এক কথায় তা ছিল অসাধারণ। এমনই করে সবাই যেন প্রতি বছর এই অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করতে পারি। শেষে বলতেই হয় মায়েরা যেমন রান্না করেন পরিবারের সকলকে খাইয়ে আনন্দ দেওয়ার জন্য, আমারও মনে হয় ঠিক তেমনই দাদা ও দিদিরা আমাদের এই সুন্দর অনুষ্ঠানটি উপহার দিয়ে আমাদেরকেও আনন্দ দিয়েছেই এবং তার সাথে সথে তারাও আনন্দিত হয়েছে দ্বিগুণ এবং ভুলে গেছে রিহাসালের সব কষ্ট, সব খাটুনি। তবে যাওয়ার আগে বলা যায়—

'চুরি যদি করতেই হয়,
তবে মানুষের মন চুরি কর।'

হ্যাঁ, অনুষ্ঠানের দায়িত্বে যারা ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেভাবেই হোক আমাদের মন চুরি করে নিয়েছে। এই চুরির জন্য আমরা সত্যিই আনন্দিত। ধন্যবাদ তাঁদের যারা এমন সুন্দর এই অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছিল।

আলো দিয়ে গেলেন যাঁরা

রাজা রামমোহন রায়	(১৭৭৪-১৮৩৩)
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	(১৮২০-১৮৯১)
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	(১৮২৪-১৮৭৩)
রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব	(১৮৩৬-১৮৮৬)
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	(১৮৩৮-১৮৯৪)
রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	(১৮৪৮-১৮২৫)
মা সারদা	(১৮৫৩-১৯২০)
জগদীশচন্দ্র বসু	(১৮৫৮-১৯৩৭)
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(১৮৬১-১৯৪১)
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	(১৮৬১-১৯৪৪)
স্বামী বিবেকানন্দ	(১৮৬৩-১৯০২)
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	(১৮৬৩-১৯১৩)
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	(১৮৬৪-১৯২৪)
ভগিনী নিবেদিতা	(১৮৬৭-১৯১১)
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	(১৮৭০-১৯২৫)
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(১৮৭১-১৯৫১)
ঋষি অরবিন্দ	(১৮৭২-১৯৫০)
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	(১৮৭৬-১৯৩৮)
বাঘা যতীন	(১৮৭৯-১৯১৫)
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	(১৮৮০-১৯৫৯)
নন্দলাল বসু	(১৮৮২-১৯৬৬)
উল্লাসকর দত্ত	(১৮৮৫-১৯৬৫)
রাসবিহারী বসু	(১৮৮৬-১৯৪৫)
প্রফুল্ল চাকী	(১৮৮৮-১৯০৮)
ক্ষুদিরাম বসু	(১৮৮৯-১৯০৮)
মেঘনাদ সাহা	(১৮৯৩-১৯৫৬)
মাস্টারদা সূর্য সেন	(১৮৯৪-১৯৩৪)
সত্যেন্দ্রনাথ বসু	(১৮৯৪-১৯৭৪)
বসন্ত বিশ্বাস	(১৮৯৫-১৯১৫)
নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু	(১৮৯৭-)
কাজী নজরুল ইসলাম	(১৮৯৯-১৯৭৬)